সুদীপ্ত মাজি

সময়ের চিহ্ন : বাংলা কবিতায় নকশাল আন্দোলনের অভিঘাত

বিশ শতকের কৃষি বিপ্লবের ইতিহাসে তেভাগা তেলেঙ্গানার সঙ্গে সমান গৌরবে উচ্চারিত হয় নকশালবাড়ির নাম। এই নকশাল আন্দোলন কেবল জমি দখলেরই লড়াই ছিল, নাকি তা রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা দখলেরই এক সর্বাঙ্গীন প্রয়াস-প্রস্তুতি— এই নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে এই আন্দোলন যে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-এলিট— সকল স্তরেই দিনবদলের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, আত্মাহুতির সেইসব গভীর গভীরতর মুহূর্তগুলি, দিনগুলি যে আমাদের যাপনপ্রক্রিয়ার ভেতর এক অনপনেয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে বিষয়ে সম্ভবত সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়িতে কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, বাংলা ভাষার অনেক কবিই দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রতি তাদের আনুগত্য। আবার কেউ কেউ সমর্থনের প্রত্যক্ষতার পরিবর্তে পরোক্ষে স্পন্দিত হয়েছিলেন, নন্দিত হয়েছিলেন এই সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উতরোলের দ্বারা। মানুষ যে আদতে একটি 'রাজনৈতিক প্রাণী' (অ্যারিস্টটল কথিত Zoon-politican)— তা সময়ের নিজস্ব স্বভাবে সাড়া দেওয়া, আন্দোলিত হওয়া এই সমস্ত সৃষ্টিশীল সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুরণনেরই ছায়াছবি থেকে আমাদের কাছে আরো একবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা জানি যে সাহিত্য তেমন কোনো অমূলসম্ভব বৃক্ষ নয় যে তার অস্তিত্ব কচুরিপানার ধর্মের সমতুল হবে। মাটিতে নিজস্ব শেকড় প্রোথিত রেখেই সে আপন ডালপালা ছড়িয়ে দেয় আকাশে। আর সাহিত্যের কেন্দ্রে থাকা মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমাপতন কিংবা দ্বন্দ্বাত্মক অবস্থিতির কারণেই সেই ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টি আত্মসাৎ করে নিতে চায় সমসময়ের নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিঘাতকে। এই সময়ের বাংলা কবিতায় তাই অনেক ক্ষেত্রেই 'তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান এই আমাদের পৃথিবী'র সুখী গৃহকোণ ভেঙে অগ্নিবলয়ের দীপ্ত শলাকা তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলে উঠেছে। বলা প্রয়োজন যে সামাজিক-রাজনৈতিক এই উতরোলের জের যেমন বাংলা কবিতার ভুবনটিকে অন্তত অংশত পরিবর্তিত হতে প্রেরণা জুগিয়েছে আবার পক্ষান্তরে এই সময়ের কবিতাও সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে সমাজ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সৈনিকদের প্রাণিত করতে চেয়েছে অন্যতর এক প্রাণনায়। এই দুই পূর্ববর্তী সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক আলোড়ন কথা বলে উঠেছে, চিত্তপ্রসাদ ও জয়নুল আবেদিনের চিত্রকলায় আর সোমনাথ হোড়ের ভাস্কর্যে যেমন আশ্চর্য দলিল তৈরি হয়েছে প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষের, সেভাবেই বলা যায় যে এই নকশাল আন্দোলন-এর উত্তাপ যেমন বাঙালির বৌদ্ধিক পরিবেশকে নিরঙ্কুশভাবে না পারলেও আলোড়িত করেছে তীব্রভাবে, তেমনি সমাজ-বদলের দিকচিহ্ন নির্মাণে এই আন্দোলনের কুশীলবদের প্রভাবিত করার কাজেও

বাংলা কবিতার ভূমিকা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। অবশ্য সকলেই যে একভাবে আলোড়িত হবেন, এমন কোনো কথা নেই। এই প্রবল উতরোলের কেন্দ্রে থেকেও সমসময়ের অনেক কবিই আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন এমন এক নিরঞ্জনতাকে যেন প্রসন্ন ভোর এসে শান্ত ও সমাহিত এক যোগনিদ্রায় অভিভূত করে রেখেছে পরিপার্শ্বকে। সেই আশ্চর্য নির্বেদ আক্রান্তও হয়েছে সেই সময়ের বিভিন্ন লেখালিখিতে। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র তাঁর 'কবিতা থেকে মিছিলে' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৯৬৮) লিখছেন :

> উপস্থিত যাঁরা কবিতা লিখছেন, মনে হয় না এই আটপৌরে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো আগ্রহ আছে, তাঁদের প্রতীক তথা প্রসঙ্গ কোন প্রচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ বেয়ে অন্য পৃথিবীতে চলে যায়, যার আদল-আলাপ-চরিত্র মঙ্গলগ্রহ থেকে আহৃতও বলা চলে।

এই রাক্ষসীবেলায় আত্মকণ্ডুয়নে ব্যাপৃত কবিতার স্বর আক্রান্ত হয় প্রাবন্ধিক জয়ন্ত চৌধুরীর কলমে :

> ষাটের দশকের শেষভাগে এবং সত্তরের শুরুতে প্রবল অস্বীকারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ উৎসব হত্যা রক্তের যে সময়কে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম এদের কবিতায় তার ছাপ যে একেবারে পড়েনি তা নয়; কিন্তু সেই সন্ত্রাস ও সম্ভাবনাময় দিনগুলিকে কবিতায় ধরার পেছনে কতটা কাব্যিক প্যাশন ছিল, আর কতটাই বা বাণিজ্যিক ফ্যাশানের উৎকট প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল, সে সম্পর্কে আমরা সন্দিহান না হয়ে পারি না।
>
> —ফিরে দেখা/জয়ন্ত চৌধুরী/সত্তর দশক : প্রথম খণ্ড: অনুষ্টুপ

এবং এই মন্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের পাঠকের মনে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের জন্ম না হয়ে পারে না যে প্রত্যক্ষ বাচনে দৃপ্ত স্বরে 'তেজী রক্তধারা'র প্রকট বা উৎকট ঘোষণা ব্যতিরেকে কি কোনো কবিতা তার সময়ের প্রতি দায়কে অঙ্গীকার করতে পারে না? অনুভবের গভীর সানুদেশে বাইরের এই প্রবল উতরোল তো অনেক সময়েই নির্মাণ করে তুলতে পারে মন্ত্রের মতন কোনো স্বর। আসলে, 'কলাকৈবল্যবাদ' ও 'মানুষের জন্য শিল্প' এই দুই মোটা দাগের বিভাজনের বাইরেও যে অন্য একটা সারণি জেগে থাকতে পারে— যেখানে শঙ্খ ঘোষের 'আধখানা মুখ বাইরে রেখো/আধখানা মুখ অন্ধকারে'-র মতো দ্বিবিধ জগতের ভারসাম্যময় এক উচ্চারণ নির্মিত হয়, তাকে উপরোক্ত আলোচকেরা কোনো এক দুর্বোধ্য এবং দুর্ভেদ্য কারণে গ্রহণ করতে পারেন না। তাই তাঁদের কলমে আক্রান্ত হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২) কখনো অরুণ মিত্র, কখনো এমনকী শঙ্খ ঘোষও, যাঁর 'বাবরের প্রার্থনা'য় জেগে থাকে সময়ের আশ্চর্য ডকুমেন্টেশন এই নকশাল আন্দোলনের বলি মেধাবী ছাত্র ও তরুণ কবি তিমিরবরণ সিংহের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে যখন শঙ্খ সান্দ্র অথচ গভীর এক মুদ্রায় মেলে ধরেন তাঁর অভিভব :

> ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশায়
> দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ

তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে ব'সে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।

নকশালবাড়ির ঘটনার পরেই র‍্যাডিক্যালদের মুখপত্র 'ছাত্র ফৌজ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় যে শীর্ষনামের সংবাদ প্রকাশিত হয় তা হল 'রক্তঝরা, বুলেটদীর্ণ নকশালবাড়ির মাঠে খসে পড়ুক সমস্ত তথাকথিত প্রগতিশীলতার মুখোশ।' আর এই ছিন্নশির তিমির— সেই বিপ্লবেরই রক্তকরবী— সেকথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ভুলে গেলে চলে না যে সমসাময়িকতার জ্বর এবং জোর কমে আয়ুধ কমে যায় সৃষ্টিকর্মের— একজন স্রষ্টাকে সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হয় সব সময়। তাই অনেক সময়েই তাঁকে রচনা করতে হয় এক শিল্পীত আড়াল— নিজের তূণীর থেকে তুলে আনা তিরটির আরো অনিবার্য লক্ষ্যভেদের কারণেই। শান্ত অথচ দৃপ্ত এক অন্তর্গত স্বরে তাঁর কবিতায় জেগে ওঠে এই সময়েরই ভাষ্য:

আমি জানি এই প্রবাহ একদিন আমার ভস্ম ব'য়ে নিয়ে যাবে। এবং আমি জানি এই জলে একদিন আমার আকাঙ্ক্ষারা ফলে উঠবে। এই প্রবাহ আমি চৈত্রেও তোমাকে দেখাই।

—জন্মভূমিতে/মঞ্চের বাইরে মাটিতে/১৯৭০

সশস্ত্র বিপ্লবই যে মুক্তির একমাত্র পথ— এই আততিতে ভর করেই তখন ডানা মেলছে মেধাবী ছাত্রমন। এরকমই এই স্বপ্নময় যুবা দ্রোণাচার্য ঘোষ, বিপ্লব ও মুক্তির এষণায় যিনি কৈশোরকাল থেকে যুগপৎ সংগ্রাম ও কবিতায় সমর্পিত প্রাণ। বিপ্লব আর কবিতা ক্রমাগত দিনবদলের স্বপ্ন তাঁকে জোতদার আর জমিদারদের চোখের বালি করে তুলেছিল :

মুঠিতে নিশান জ্বলে, মেহনতি মানুষের রক্তের অক্ষরে
লেখা হয় দৃপ্ত এক মুক্তির শরীর।
যা ছিল পুরোনো কথা পরিত্যক্ত সেসব এখন
গভীর বিশ্বাসে জ্বলে সশস্ত্র বিপ্লব।
মুক্তি এই এক পথে, অন্য কোনো শব্দ নেই বুকের ভেতর।

—দ্রোণাচার্য ঘোষের কবিতা

সৃজন সেন, 'দ্রোণাচার্যের কবিতা প্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনায় লিখছেন : '১৯৭১ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আছি। চারদিক থেকে জেল ভেঙে বিপ্লবীদের পালিয়ে যাবার সংবাদ আসছে। তিয়াত্তর সালের মধ্যে সব জেল ভেঙে পড়বে— এরকম একটি আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের বন্দি সাথীদেরও উদ্দীপিত করে তুলেছে। এমন সময় একদিন সকালের খবরের কাগজে পড়লাম, দ্রোণাচার্য হুগলী জেলের পাঁচিল টপকাতে গিয়ে জেল সিপাইদের গুলি বুকে ভরে নিয়ে দারুণ ক্রোধে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে ফুটতে মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের ওয়ার্ডের সকলে শহীদ দ্রোণাচার্য ঘোষের নামে লাল সেলাম স্লোগান দিয়ে উঠল। এভাবে ১৩৭৮ সালের ২৪ মাঘ সত্তরের বাংলা কবিতার প্রথম শহীদ কবি

দ্রোণাচার্য ঘোষ একটি উজ্জ্বল লাল নক্ষত্র হয়ে উঠলেন, বিপ্লবের আকাশে। দ্রোণাচার্যের মৃত্যু সমকালীন বাংলা কবিতাকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল। সনৎ দাশগুপ্ত 'দ্রোণ' নিয়ে লেখা তাঁর কবিতায় উচ্চারণ করলেন :

রক্তমাখা দ্রোণফুল পড়ে আছে ঘাতকের থাবার তলায়
ওই ফুল একদিন ফুটেছিল জ্যোৎস্নায়, কবিতায়

দ্রোণাচার্য ঘোষের এই আত্মাহুতির অভিঘাত সত্তরের কবি মৃদুল দাশগুপ্তের 'এল পার্টিডো কমিউনিস্তা' কবিতায় এক আশ্চর্য স্বপ্নঘন চিত্রকল্প রচনা করল :

তারা ঘুমায়, বুকের ক্ষতে এদেশ ভারতবর্ষ আঁকা
জাগে হাজার, জানে কোথায় রাক্ষস-প্রাণ-ভ্রমর রাখা;
পাতার ওপর শব্দ পায়ের
হারিয়ে যাওয়া সেই যে ভাইয়ের
একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে
চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।

কিংবা তাঁরই লেখা 'আগামী' কবিতায় :

ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ!
ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ

১৯৭১ এর ১২-১৩ আগষ্ট কাশীপুর বরানগরের যে নকশাল দমনের নামে নারকীয় গণহত্যা চলে— তারই ছায়াচিত্র বিধৃত হয়েছে মৃদুলের উপরোক্ত কবিতায়। দেবাশিস ভট্টাচার্য তাঁর 'সত্তরের দিনগুলি (প্রথম পর্ব)' গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছেন : '২ সেপ্টেম্বর' ৭১ রাজ্য সরকার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার আর. এন. চ্যাটার্জি ও রাজ্য পুলিশের আই.জি. প্রসাদ বসুকে নির্দেশ দেন কাশীপুর ও বরানগর থানার পুলিশ ডায়েরিতে যে রিপোর্ট লেখা হয়েছে তা 'সিল' করার জন্য। আজও প্রশ্ন জাগে কী হল সেই 'সিল' করা রিপোর্টের?' কী আশ্চর্য, কীভাবে হাউইয়ের মতো হারিয়ে যায় এই তরুণ নবীন প্রাণগুলি? এভাবেই জীবনের উৎসর্জনে মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকেন মুরারি মুখোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তিমিরবরণ সিংহ প্রমুখ অকালপ্রয়াত তরুণ বিপ্লবী কবিরা। মুরারি মুখোপাধ্যায়ের 'ভালবাসা' কবিতায় আমরা পাই এমন উচ্চারণ :

ভালবেসে ফুল হয়ো নাকো
পারো যদি বজ্র হয়ে যাও
আমি সেই শব্দ বুকে নিয়ে
দিকে দিকে লড়াই-এর বার্তা ছুঁড়ে দেব।

কথাকার আবুল বাশার তাঁর একটি অনন্যসাধারণ গদ্য 'স্লোগান থেকে শ্লোকে' (রক্তমাংস : ৪/১৯৯০) বলেছিলেন :

দু-একজন মানুষকে আমি দেখেছি— যাঁরা রাজনীতি বলতে এক উন্নত হৃদয়বৃত্তিকে বুঝেছিলেন, কবিতার সঙ্গে এইসব মানুষগুলির হৃদয়ের খুবই নিবিড় যোগ ছিল হৃদয়কে ভালবাসায় ভরে রাখতে হলে, অন্যের জন্য মমতা-স্নেহ সঞ্চার করতে হলে, দেশের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে হলে মহৎ কবিতার দ্বারস্থ না-হয়ে উপায় নেই। অনেকেই কবিতা লেখার চেষ্টা করতেন। কবি হওয়ার জন্য নয়, হৃদয় যাতে রসস্থ থাকে সেজন্য। যেমন কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও-জে-দং, হো-চি-মিন, প্রত্যেকেই কবিতা লিখেছেন।

দ্রোণাচার্য, মুরারি, তিমিরবরণদের সমাজমুক্তির স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি কবিতা লেখার প্রচেষ্টাটি এরকম বিশ্বাসকেই সমর্থন করে না? 'সত্তর দশকের রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে গৌতম সেন জানাচ্ছেন : 'সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার জোয়ারে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ভেসে যাচ্ছে, তখন একমাত্র ব্যতিক্রম এই নকশালপন্থি আন্দোলন, যা প্রতিক্রিয়াকে আঘাত করেছে, ফলে প্রত্যাঘাত সয়েছে সবচেয়ে বেশি।' সেই আদর্শের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপে আলোকিত পথই যেন বা প্রশস্ত হয়ে উঠেছে এই সময়ের উচ্চারণগুলিতে :

তুমি তোমার দুচোখ ভরে আগুন ধরে রাখো
হৃদয়কলস পূর্ণ করে রাখো প্রবল ঘৃণা
বীজ ও মাটি শস্য দিয়ে যাচাই করে দেখো—
প্রেমিক আমায় বলবে তুমি দেশপ্রেমিক কিনা?

—অনুরোধ : থানা গারদ থেকে মা-কে : সৃজন সেন

পুলিশের নির্মম দাওয়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত, নিথর দেহগুলি এ সময় পথে পথে পড়ে থেকেছে অবিরল। কখনো-বা উধাও হয়ে গেছে লাশ। পুলিশি নির্বিচার সন্ত্রাসের আশ্চর্য ছায়াপাত ঘটেছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দেব প্রমুখের এই সময়ের কবিতায়। বীরেন্দ্রর একটি কবিতায়— দরজার বাইরে আঁচড়ের শব্দে সন্ত্রস্ত শিশুকন্যাকে মা জানিয়েছেন— এই আঁচড়ের শব্দ বাঘের থাবার নয়, পুলিশের। আমরা লক্ষ করি, এই বাঘের অনুষঙ্গ বীরেন্দ্রর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে :

যা লেখ যা ইচ্ছে লেখ কিন্তু খবরদার
দিও না সাপের লেজে পা
বলো না, নরখাদক বাঘ মানুষের মাংস খায়—
যা লেখ কবিতা লেখ কিন্তু সে তোমার মাথায় দিয়েছে দিব্যি, যা
কদাচ প্রকাশ্য নয়, এ— ভরসন্ধ্যায়, এই কালবেলায়
করতে হবে উচ্চারণ?

—যা লেখ, কবিতা লেখ'/মুণ্ডুহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে।

পুলিশি সক্রিয়তার অভিজ্ঞান এভাবেই বারবার ফুটে উঠেছে সমসময়ের বাংলা কবিতায় :

১ অনির্বাণের দিদির চিঠি পাই
তেসরা জুনের বিষণ্ণ বিকেলে
'তোমার বন্ধু আর নেই
পয়লা মে'র ভোর রাতে

প্রেসিডেন্সি জেলে—
পুলিশ রিপোর্ট সাংঘাতিক ভেদবমিতে!
ওর জীবন সাথী অরুণা অর্ধ-উন্মাদ
নিশ্চয় একদিন এসো...
—প্রেসিডেন্সি জেলে রক্তাক্ত দেহে অনির্বাণ/সুশীল পাঁজা

২ আজ রাতে ওরা কি আবার আসবে?
তুই ঘুমো খোকন। তোর কুঁকড়ে-যাওয়া
নীল ঠোঁটের পাশ দিয়ে এখন আর
রক্ত গড়িয়ে পণঝড়ছে না পাতা-খোলা কম্যুনিস্ট ইসতেহারের
উপর! তোর খুবলে-আনা চোখের গহ্বরে
শুধু জমাট বেঁধে আছে বিশাল স্বপ্ন।
—শহিদের মা/সব্যসাচী দেব

৩ অধ্যাপক বলেছিলো, দ্যাটস্ রঙ, আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে!'
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিইনি শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'
চটকলের ছকুমিঞা, 'এবার প্যাঁদাব শালা হারামি ও.সি.কে।'
উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সে ডানপিটের তেজি রক্তধারা
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।'
—গান্ধীনগরে এক রাত্রি/মণিভূষণ ভট্টাচার্য

গণবিপ্লবের এই আগুন ঝরানো দিনগুলিতে সহমর্মী হয়ে, সহকর্মী হয়ে যেন বা পাশে থেকেছে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চারণ :

আমি সেই চণ্ডাল
প্রত্যেকটা চিতার পাশে জেগে থাকছি
প্রত্যেকটা চিতার পাশে, আগুন আগলে রাখছি ঘৃণায়।
—মার্চ '৭৩ : ম্যানিফেস্টো

সেদিনের আরেক তরুণ-তুর্কী নবারুণ ভট্টাচার্য অস্বীকার করেছেন এই নরমেধ যজ্ঞের অধিবাসস্থলকে—'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।' কিংবা পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ, যেখানে সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে'-র ছায়াপাত লক্ষ করি আমরা, যে উচ্চারণকে পরবর্তীকালে গানে অমরতা দিয়েছেন প্রতুল মুখোপাধ্যায় : 'ভয় পাসনে ছেলে/কেউটে কিম্বা গোখুর নয় ও সাপ নেহাত হেলে' অথবা বিপুল চক্রবর্তীর কবিতায় প্রতিবাদের দীপ্তিমান ভাষ্য :

তোমার মারের 'পালা শেষ হলে
আমাকে যেন ডোরাকাটা বাঘের মতো দেখায়।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম হোতা চারু মজুমদারের 'খতম লাইন' যে এই আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি করেছিল, সেকথা তিনি নিজেও স্বীকার করে গেছেন—
We have tried to develop the army in some areas without class struggle

and have failed. Without class struggle—the battle of annihilation—the initiative of the poor peasant masses cannot be released, the political consciousness of the fighters cannot be raised, the new man cannot emerge, the peoples army cannot be created.

—Charu Majumder's speech introducing the political—organisational report at the Party Congress. (from *Sen Panda & Lahiri, Naksalbari and after, Katha Shilpa, 1978, pp. 291-295)*

যেমন বিদ্যাসাগর, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রমুখের নামের সঙ্গে যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা যুক্ত, তাকে মুছে ফেলতেই এই সমস্ত মণীষার মূর্তি ভাঙার প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়েছিল নকশালরা। এই ভুল কার্যক্রম অনুমোদন পায়নি এমন একটি উচ্চারণ দিয়েই শেষ করা যাক বর্তমান নিবন্ধপ্রয়াস। খুব প্রত্যক্ষত তো নয়, একটু দূরাগত অনুষঙ্গে এখানে ছায়া ফেলেছে এই ঘটনাসমূহ :

ভাবমূর্তি নষ্ট হবার ভয়ে মূর্তি ভাঙিনি কোনোদিন;
কিন্তু জানবার লোভে, নিজেকে ভেঙেছি অজস্রবার।

—বৃত্তের ভেতর/জীবন দেখায়/ব্রত চক্রবর্তী

ওই...ভাঙার বদলে আত্মসমালোচনায় অভিনিবেশ করা এবং প্রশ্নের মুখোমুখি পরিপ্রশ্নকে সাজিয়ে তুলে সঠিক দিশায় আন্দোলনের গতিপথকে চিহ্নিত করতে না পারার ফলশ্রুতিতেই হয়তো-বা এক অর্থে নিষ্ফল ও অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল এই অন্যতর রাজনৈতিক পথপরিক্রমার ইতিবৃত্তখানি। আর সেই স্বপ্ন ও দীর্ঘশ্বাসের ভাসমান ধূলিকণাগুলি সময়ের চিহ্ন নিয়ে বাংলা কবিতার অক্ষরে অক্ষরে তার বাষ্পচাপকে চিহ্নিত করে রেখেছে নিজস্ব রকমে।